# বেচারা

## সান্ত্বনা চট্টোপাধ্যায়

**শান্তনুঃ**

কথায় আছে স্বপ্নবিলাসী। তা সবাই বলে আমাদের বিলাস রায় ওরফে মন্টু এই খেতাব সহজেই অর্জন করতে পারে। ছোটোবেলায় হাফপ্যান্ট পরা অবস্থা থেকেই মন্টুকে দেখলেই আমরা বলতাম, 'এই যে স্বপ্নবিলাসী এসে গেছেন।' তা মন্টু ঠাট্টাতামাশা গায়ে মাখত না কোনোকালেই।

'স্বপ্ন দেখা অত সোজা নয়, বুঝলি, স্বপ্ন দেখতে এলেম দরকার। আমি কী রকম টেকনিকালার স্বপ্ন দেখি তোরা জানিস! শুনলে তোরা হিংসায় কাঁচা পেয়ারা হয়ে যাবি। তোরা হাজার চেষ্টা করলেও আমার মতন স্বপ্ন দেখতে পারবি না, বুঝলি – অনুভূতি দরকার, বুঝলি, অনুভূতি – তোদের মতন কেঠো পাজীদের কম্ম নয়।'

'কেন রে ব্যাটা! কী এমন স্বপ্ন দেখিস, যে আমরা দেখতে পারব না?' রতন তো রেগে আগুন, 'আর রঙিন স্বপ্ন দেখাটা কী এমন ব্যাপার, এই তো সেদিন আমি দেখলাম লাল সালোয়ার পরে পরী চলেছে রাস্তা...'

'এই, এই, শুরু হল প্রেমাখ্যান... চুপ, চুপ কর বলছি!' আমরা সবাই তেড়ে উঠলাম।

'সত্যি, একে নিয়ে আর পারা যায় না, দেখ না দেখ পরীকে টেনে আনে। তুই ব্যাটা পরীর স্বপ্ন দেখার কে রে? তোকে পাত্তা দেয়? একবারও তোর দিকে ফিরে তাকায়? ফেকলু কোথাকার! পরীর স্বপ্ন দেখতে হলে বিমান দেখবে, পরীর সঙ্গে ওর হেভি ইয়ে, পরী এখান দিয়ে যাবার সময় আড়চোখে কেমন তাকায় দেখেছিস বিমানের দিকে!' ছটকু ফোড়ন কাটে।

বেটা বিমানের চামচা, আমাদের ভাল না লাগলেও কেউ কিছু বলি না। কী করে বলব – বিমানের চেহারাটা দেখলে গলা দিয়ে আর কথা বেরোয় না। এই লম্বা, ইয়া চওড়া বুক, একেবারে অরণ্যদেব; আমরা তো সব ছুঁচো ওর কাছে। আমাদের কি ইয়ে আছে শালা যে পরী বিমানকে ছেড়ে আমাদের দিকে তাকাবে?

মনে মনে বিমানকে পরীর সামনে এক চড়ে নর্দমায় ফেলে দিলাম। এ ছাড়া আর উপায় কী, আর কি-ই বা করতে পারি। পরী আমাদের পাড়ার সম্পদ। যেমন দেখতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি খেলাধুলায়, এক্কেবারে, সর্বগুণসম্পন্না যাকে বলে। পাড়ার সব জোয়ান ছেলেদের বুকে পরীর নামে ব্যাথা আছে। আমার ব্যাথাটা অনেক গভীর, অনেক বড় ক্ষত। এরা সে ব্যাথার কী বোঝে, এক-একটা গণ্ডার। পরীর বাড়িতে একমাত্র আমার যাওয়া-আসা আছে, তাই এরা আমাকে অনেকটা সমীহ করে। পরীর ছোটোভাই এবার মাধ্যমিক দিচ্ছে, তাকে অঙ্কটা পড়াই আমি। আমাদের মধ্যে, ছটকু তো পানওয়ালা, গো-মুখ্যু, আর বিমান অর্ধশিক্ষিত, টাকাওয়ালা বাপের সুপুত্তুর, স্কুলের দশক্লাসের গণ্ডি পার হয়নি। রতন গ্র্যাজুয়েট, কিন্তু ওর বাবার সোনার দোকানে বসে। আমি আর মন্টু একসঙ্গে আশুতোষ কলেজ থেকে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে পাশ করে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাইটে এম বি এ করেছি। গত ছ-মাস ধরে বেকার।

বিমানকে কিছু না বলার আরো কারণ আছে। ওর বাবা শালা প্রমোটার, অনেক কালো টাকায় পকেট সব সময় গরম। কারণে-অকারণে ধার দেয়, রেস্টুরেন্টে নিয়ে খাওয়ায়। এক্ষুণি দরাজ গলায় বলল, 'চল, নবীনায় ম্যাটিনি শো-টা মেরে আসি।' বিমান থাকলে আমরা কেউ পকেটে হাত দিই না। আজ আমার মুড নেই। বললাম,

'না রে, তোরা যা, আমি আজ যেতে পারব না।'

‘কেন রে, তোর কী রাজকার্য আছে?’

‘তোরা তার কী বুঝবি রে, আকাট মুখ্যুর দল! আমার আজ একটা চাকরির ইন্টারভিউ আছে।’

বেশ গর্বের সঙ্গে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে আমি উল্টোদিকে হাঁটা দিলাম। মনটা শালা এখন নিম-তেতো। আমার তো সবই ছিল, শিক্ষা, পরিচয়, চেহারা – সবাই তো বলে আমাকে নাকি অনেকটা হৃত্বিকের মতন দেখতে। চাকরিও পেতে চলেছি। তবে আমি শালা বিমানের থেকে কম কিসে? যদি না ভগবান মেরে না রাখত। শালার ভগবানের কি আর কোনো কাজ নেই, লোক বেছে বেছে বাঁশ দেওয়া। আমার ইন্টারভিউ দুপুর আড়াইটে। এখন বাজে দশটা চল্লিশ, হাতে অনেক সময়। ঘুরে আসব নাকি কবিরাজের কাছ থেকে? শুনলাম, বেটার ছেলে ধন্বন্তরী, একটা ট্রাই নেব নাকি!

‘আরে, আরে, কে রে ধাক্কা মারছিস!’ চমকে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি, মন্টুটা দাঁত কেলাচ্ছে – হাঁফ নিয়ে বলল, ‘কোথায় ইন্টারভিউ রে তোর! কিছু বলিস নি তো আগে!’ আমি ভয়ানক মুখ করে বললাম, ‘যাচ্ছি একটা শুভ কাজে, দিলি তো বাধা শালা আহাম্মক। মারব পাছায় এক লাথি।’ মুখ কাঁচুমাচু করে মন্টু, ‘রাগ করছিস কেন রে। জানিস তো আমার বাড়ির অবস্থা। ছোট বোনটা শালা রোজ বিনুনি দুলিয়ে, ব্যাগ ঝুলিয়ে আপিস যাচ্ছে। প্রেস্টিজে আলকাতরা। তোর ছোটমামা তো ইনফোসিস’য়ে – একটু বলিস না আমার হয়ে। তুই না আমার হাফ-প্যান্টের ইয়ার! স্বপ্ন-টপ্ন সব ছাইরঙা হয় গেছে রে, রং-টং সব মুছে যাচ্ছে।’ থালার মতন গোল মুখটাকে যথাসাধ্য করুণ করল।

আমি চোখ সরু করে দেখলাম ওকে। বটে, এই নাকি স্বপ্নবিলাসী। বেটাচ্ছেলে ছ-মাসেই টেকনিকালার থেকে সাদা-কালোতে নেমে এসেছে। জীবনে রঙ না থাকলে স্বপ্নে দেখে না যে, সে আবার স্বপ্নের, অনুভবের রেলা নেয়।

‘আমাকে দেখ, দ্যাখ শালা আমার দিকে তাকিয়ে। আমি স্বপ্নে পরীকে দেখেছি, শালা আমার বিছানায়। আমি পেরেছি রে, স্বপ্নে পেরেছি রে শুয়ার। ঘুমের থেকে উঠে তোদের মতন পায়জামা কাচতে দিতে হয় না রে আমায়, তবু আমি স্বপ্নে পেরেছি রে শালা।’

মন্টুর ঝুলে পড়া হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে একরকম আত্মপ্রাসাদে মনটা ভরে উঠল। বোঝো এখন, ভাব শালা, ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ কর। আমার মতন ইয়েরা স্বপ্নে করতে পারে কিনা জেনে নে। আমি তো শালা বলেই খালাস। পিছন ফিরে না তাকিয়ে হনহনিয়ে বাসস্টপের দিকে চললাম। বাঁশদ্রোনীর মহুয়া সিনেমা হলের পিছনের গলিতে বাড়ি, সেখানেই রোগী দেখেন। যাই একবার লাক ট্রাই করে আসি।

**মন্টুঃ**

যাচ্চলে। কিসের থেকে কী! এত রাগের কী আছে রে বাবা। মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমার ছোটবেলাকার বন্ধু, কিছু আর জানতে আমার বাকি নেই ওর বিষয়ে। করুণা হল আমার, রাগ এল না। আমি জানি তো শান্তনুর ব্যাথাটা কোথায়। বেচারা, স্কুলের শেষের দিকে যখন আমাদের সকলের ঠোঁটের উপর হাল্কা গোঁফের রেখা উঠছে, শরীরের বিশেষ স্থানে বিশেষ আবেদন, গলার স্বর ভাঙা ভাঙা, শান্তনু কেমন যেন অন্য রকম। মেয়েদের শরীর নিয়ে আলোচনায় যোগ দেয় না, মনমরা মতন হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

একদিন আমি চেপে ধরলাম, ‘কী হয়েছে রে শান্তনু, এমন একা একা হয়ে ঘুরিস কেন? বাড়িতে কোন ঝামেলা হল নাকি আবার?’

শান্তনুর বাড়িতে নানা অশান্তি। ওরা চার ভাইবোন। ওদের বাবা ফুটবল প্লেয়ার ছিলেন, কালীঘাট ক্লাবে খেলতেন। একটা প্র্যাকটিস ম্যাচে বুক দিয়ে বল আটকাতে গিয়ে গুরুতর আহত হন। অনেকদিন বিছানায় শোয়া ছিলেন, কোনরকম রোজগার নেই, সংসার চলে না। সেই সময় ওদের বাবার বন্ধু, শান্তনুর পল্লবকাকা, এসে ওদের সংসারের হাল ধরলেন। ওদের বাড়িতেই থাকতেন, ওদের মা'কে বৌদি বলে ডাকেন। ভাইবোনেদের মধ্যে শান্তনু সবথেকে বড়, তাই ওর অনেক কিছুই চোখে পড়ে যা বাকিরা বোঝে না। শান্তনু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারল, ওদের মা আর পল্লবকাকার মধ্যে একটা অন্য রকম সম্পর্ক আছে, আর সেই নিয়ে বাবার সঙ্গে মার অনেক কথা কাটাকাটিও শুনতে হয়েছে তাকে রাত্রিবেলায়।

এখন আমার মনে হয়, হয়ত মাসীমার কিছু করার ছিল না। চারটে ছেলেমেয়ে, অসুস্থ স্বামী, সংসার চলবে কী করে? হয় ঝি-গিরি করতে হত নয় তো রাস্তায় নামতে হত, তার চেয়ে অনেক সহজ রাস্তা বেছে নিয়েছিলেন মহিলা। কিন্তু এমন অপমানের জীবন মেসোমশাই বেশীদিন সহ্য করতে না পেরে একদিন গলায় দড়ি দিলেন। কিছুদিন পাড়ায় লোকেদের ফিসফাস, ছিছিক্কার, তারপর একদিন থেমে গেল, কিন্তু একটি সরল-সোজা কিশোর মনে একটা বিরাট ধাক্কা। সে সময় শান্তনু বহুদিন আমাদের বাড়িতে রাত কাটিয়েছে। স্কুল-ফেরত আমাদের বাড়ি চলে আসত। ধীরে ধীরে এসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছিল, কিন্তু কেমন যেন অন্তর্মুখী, তিক্ত আর অসহিষ্ণু।

'আচ্ছা মন্টু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, কারুকে বলবি না তো?'

'কী কথা রে?'

'কেন রে ব্যাটা, কী কথা, না বললে প্রমিস করবি না?'

'কী মুশকিল, এত চটে যাস কেন। এমনি জিজ্ঞাসা করলাম, না বলব না কারুকে, কী হয়েছে বল না।'

'শোন, শুধু তোকে বলছি, আর কেউ জানে না, যদি কারুকে বলেছিস, তোকে কিন্তু গলা টিপে মেরে ফেলব বলে দিচ্ছি।'

এবার আমার ভয় এসে গেল। 'কেন রে, তুই কি কোনো মার্ডার-টার্ডার প্ল্যান করেছিস নাকি! না ভাই আমাকে বলতে হবে না, তুই আর কারুকে বল বরঞ্চ। আমি স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি, ক্রিমিনাল নই। আমার ওপর আমার মা, বোন তাকিয়ে আছে, তুই আর কিছু বলিস না।' ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। আমি একটু ভীতু প্রকৃতির মানুষ।

শান্তনু কেমন অবাক হয়ে আমার দিয়ে তাকিয়ে রইল। 'তুই ভাবলি কী করে আমি কারুকে মার্ডার করতে পারি? যাঃ শালা, ভাগ এখান থেকে, তুই আমার বন্ধু হবার যোগ্যই নোস। ভিতুর ডিম কোথাকার, স্বপ্ন দেখেই জীবন কাটিয়ে দে, জীবনের কঠিন সমস্যার কথা তোকে কি বলব, আমিই পাগল যে তোর কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিলাম!'

এবার আমি শান্তনুকে জড়িয়ে ধরলাম, 'আমার ভুল হয়ে গেছে রে, আমাকে ক্ষমা করে দে। বল না। তুই তো জানিস তোর কোন কথা আমি কারুকে কোনদিনও বলিনি। বল, জানিস না?'

শান্তনু কেমন ভাবালু মুখে তাকিয়ে ছিল। এবার চোখ মাটির দিকে নামিয়ে নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর পুরুষাঙ্গ কি শক্ত হয়?' প্রথমটা আমি ঠিক বুঝিনি, কিছুক্ষণ ওর দিয়ে তাকিয়ে থেকেও যখন দেখলাম শান্তনু মাটির থেকে চোখ তোলে না, হঠাৎ কথাটার অর্থ আমাকে যেন চাবুক মারল? 'কেন রে, তোর বুঝি... মানে তুই কি...' আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না।

'হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছে, আমি কোনদিন পারব না...'

আমি হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে বললাম, ‘না না তা কেন ভাবছিস! হয়ত তোর এখনো সময় হয়নি, মানে অনেকের তো পরেও হয়। তুই ডাক্তার দেখা না।’

কোন কথা না বলে শান্তনু ফিরে গেল। ওর যাবার পথের দিকে তাকিয়ে থেকে আমার ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল – বেচারা!

এ বয়সে এসে আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, শান্তনুর গণ্ডগোলটা হয়ত শারীরিক নয়, মানসিক। ছোটবেলা থেকে যে এত কিছু দেখেছে, এমন কি এক রাত্রে নাকি পল্লবকাকা আর মাসীমাকে একসঙ্গে এক বিছানাতেও দেখেছিল, সেই রাত্রির পরে পনেরো দিন বাড়ি ফেরেনি রাত্রি বেলায়। আমার মা-বাবা খুব স্নেহ করতেন, কিচ্ছুটি জিজ্ঞাসাও করেন নি, বাড়ি ফিরতেও বলেন নি। একদিন নিজে থেকেই বাড়ি ফিরেছিল। আমার খুব সন্দেহ হয়, অনেকবার ভেবেছি ওকে মানসিক ডাক্তার দেখাতে বলব, কিন্তু যা রাগী, বলতে সাহস হয় নি।

হ্যাঁ, ‘বেচারা...’, আমি এখনও ওর অপসৃয়মান শরীরের দিকে তাকিয়ে এই কথাই ভাবছিলাম।

**পরীঃ**

শান্তনুদা কেমন ভালমানুষের মতন থাকে। দেখে মনে হয় ভাজা মাছটা উলটে খেতে জানে না। কিন্তু আমি জানি, সব ক’টা ছেলের মধ্যে সব চেয়ে চালু ছেলে। ভাইকে পড়াতে আসে যখন, কতবার যাই ঘরে, চা নিয়ে, জলখাবার নিয়ে, মাঝে মাঝে আমার নিজের অঙ্কটা দেখাবার ছল করে, মুখের দিকে তাকিয়েও দেখে না। লাজুক লাজুক মুখে টেবিলের দিকে তাকিয়ে কথা বলে। কেন বাবা আমি, কি বাঘ না ভাল্লুক? নাকি আমাকে দেখতে খারাপ? রাগে গা আমার জ্বলে যায়। দেখ বাবা বিশ্বামিত্র, তোমার ধ্যান আমি ভাঙবই। এ আমার প্রতিজ্ঞা। ঈশশ... আমাকে উপেক্ষা!

ছটকুর পানের দোকানের সামনে আড্ডা মারা হচ্ছে। কী করে যে ওর মতন এমন শিক্ষিত, মার্জিত ছেলে বিমানের মতন একটা গুণ্ডার সঙ্গে আড্ডা মারে, কে জানে! বিমান তো আমাকে বিরক্ত করে মারল। বদমাশ কোথাকার। ওর সঙ্গে ফস্টিনস্টি করা যায়, শারীরিক হওয়া যায়, কিন্তু প্রেম – ম্যা গো! বাবার টাকা আছে, মনে করেছে সবাই কে টাকা দিয়ে কিনে নেবে। মন্টুদাকে ধরতে হবে, ওর সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব। মন্টুদারও যেন কেমন কেমন ভাব। ছোটবেলা থেকে দাদা বলে ডাকি, দাদার মতনই ভাবি, ওর বোন লাবনী যদিও আমার থেকে দু-বছরের বড়, আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। ওর কাছেই শান্তনুদার সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারি। ওর জন্য আমার ভারি কষ্ট হয়। কেমন দুঃখের জীবন। আমার ভীষণ ইচ্ছে করে ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করি, ভালবাসি, ওর সব দুঃখ, সব কষ্ট ভাগ করে নিই। আমার শান্তনু। একদিন ওকে আমার করে ছাড়বই। আমার জেদ তো জানে না।

ঐ তো শান্তনু আসছে এদিকে, ডাকব নাকি? ‘ও শান্তনুদা, কোথায় যাচ্ছ?’ একবার তাকাও, এখানে তো আর আমাকে অস্বীকার করতে পারবে না বাবু, মনে মনে বলি।

ওর থতমত ভাব দেখে আমার ভীষণ মজা লাগছে।

‘এই তো, একটা ইন্টারভিউ আছে।’

‘কটার সময়?’

‘আড়াইটে।’

‘বাবা, সে তো অনেক সময় বাকি। চল না, চা খাবে? এস না প্লীজ। তোমার ইন্টারভিউ কোথায় গো?’

‘ক্যামাক স্ট্রীট।’

তাই নাকি? চল না আমরা জীবনকাকুর দোকানে চা-তেলেভাজা খেয়ে নিই। আমি সেই সকালে বেরিয়েছি, জানো! ভীষণ ক্ষিদে পেয়ে গেছে। এসো এসো।’

শান্তনুর হাতটা ধরে এগিয়ে গেলাম। বাপরে বাপ কি ঠাণ্ডা হাত। এই বয়সী ছেলের এমন ঠাণ্ডা হাত হয় নাকি?

আমাদের দেখে জীবনকাকু একটু অবাক হয়ে গেল।

‘কিরে, তোরা দুজনে? কী চাই?’

‘জীবনকাকু ভীষণ ক্ষিদে পেয়ে গেছে। শান্তনুদাকে আমি ধরে এনেছি, ভাইকে পড়াতে গেছিল’, একটু মিথ্যে কথা বলতে হল, আড়চোখে দেখলাম শান্তনুকে, মুখটা কি একটু লাল? ‘বাড়িতে মা ছিল না, চা-পাতা শেষ। ভাবলাম তোমার দোকানে চা খেয়ে যাই। এক প্লেট তেলেভাজাও দিও।’

আমি একতরফা অনেক কথা বলে গেলাম। তিনি নিরুত্তর। বিরক্তির একশেষ। চা তেলেভাজা শেষ, এবার কি করা। রাস্তায় নেমে একটু চাপা হেসে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘কী হল কী, এত চুপচাপ। আমি কি এতই খারাপ যে একটা কথাও বলতে ইচ্ছে করে না?’ এবার দেখলাম পাথর গলেছে।

‘না না, তা কেন। কোনদিন তো এরকম কাছে আসো নি, তাই অবাক হয়ে গেছিলাম। তার উপর তুমি আবার বিমানের ইয়ে। বিমান রেগে গেলে আবার খুব মুশকিল কিনা।’

আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। ‘কে বলেছে আমি বিমানের ইয়ে? কে বলেছে বল শীগগিরি!’

‘আরে আরে এত রাগ করছ কেন। ছটকুর দোকানে শুনলাম কিনা, তাই বললাম। না হলে তো ভাল।’

‘কেন, ভাল কেন?’ আমার হাসি পেয়ে গেল।

‘না মানে, গুণ্ডা মতন তো, তাই বলছি আর কি।’ আমতা আমতা করছে দেখে আমার কষ্ট হল বেশ। ‘ঠিক আছে। এবার থেকে কেউ এরকম বললে বলে দিও, একদম বাজে কথা। কি, বলবে তো?’

শান্তনু নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, ‘ঠিক আছে।’

‘তোমার ইন্টারভিউ তো এখনও অনেক দেরী আছে, আমাদের বাড়ি চল না, একটা অঙ্ক এমন আটকে গেছে কিছুতেই পারছি না।’ শান্তনুর কোন আপত্তি না শুনে জোর করে নিয়ে এলাম বাড়ি। আমাদের পড়ার ঘরটা চিলেকোঠায়। সোজা উপরে নিয়ে গেলাম। উপরে উঠবার সময় দেখলাম মা রান্না ঘরে ব্যস্ত। বাবা তো অফিসে। ছোট ভাই স্কুলে।

ঘরে ঢুকে আমি শান্তনুকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলাম। ভয়ানক চমকে নিজে ছাড়িয়ে আমার দিকে ফিরে তাকাল, ‘কী করছ?’ ‘কী আবার, একটা মেয়ে আর একটা ছেলে যা করে তাই।’ বলেই আমি শান্তনুর মুখটা টেনে নামিয়ে আনলাম, মুখটা উঁচু করে একটা গভীর চুমু দিলাম ওকে, আমার হাতটা ধীরে ধীরে ওর জামার বোতামগুলো খুলে দিচ্ছিল।

লক্ষ্য করলাম, ওর শরীর ক্রমশ নরম হয়ে আসছে, একেবারেই বিমানের মতন নয়। এরকম অবস্থায় বিমানের নিম্নাঙ্গ শক্ত হয়ে আমার শরীরে আঘাত করতে থাকে। বিমানের হাত অস্থির হয়ে ওঠে আমার সারা শরীর জুড়ে। কিন্তু এ কী, শান্তনু কেমন নিস্তেজ, নির্বাক দাঁড়িয়ে। আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে এক পা পিছিয়ে গেলাম। শান্তনুর মুখটা ফ্যাকাশে, নীলচে হয়ে গেছে। আমার চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। মাটির দিকে মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

‘কী হয়েছে শান্তনু! অন্য কারুকে ভালবাস?’

মাথা নাড়ল, ‘না, আমি... আমি পারি না...’

আমার সর্বাঙ্গ ঘৃণায় রি রি করে উঠল। ‘ছিঃ! চলে যাও এখান থেকে, চলে যাও!’ দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলাম।

কিছু না বলে মাথা নিচু করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। আমার বুকের ভিতর থেকে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। মনে মনে বললাম, ‘বেচারা।’